একটি গণ্ডূষ জল

সাম্প্রদায়িকতা ও অস্পৃশ্যতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ

জ্যোতির্ময় ঘোষ

পুনশ্চ
৯এ, নবীন কুণ্ডু লেন
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

প্রসঙ্গত

গৌরীদিকে আজ আবার খুব মনে পড়ছে। মাঝে মাঝে তাঁর কথা মনে হয়। স্বামী-পুত্র খ্যাতির শীর্ষে অথচ তিনি নেই। তাঁদের নিয়ে তাঁর তৃপ্তি ও গৌরবের সীমা ছিল না। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমরা অনেক বছর একসঙ্গে অধ্যাপনা করেছি। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রফেসর-হেড হয়ে যোগ দিই ১৯৭৮-এর জুলাই মাসে। বিচারপতি তারাপদ মুখোপাধ্যায়ের পরামর্শে। আমি যখন স্কুলের ছাত্র, তিনি ছিলেন রামপুরহাটের মুনসেফ। তারাপদকাকাবাবু আর প্রজ্ঞাকাকিমা তখন থেকেই আমাকে ছেলের মতো স্নেহ করতেন। কাজেই যাদবপুর ছেড়ে কল্যাণীতে যাওয়ার আগে তাঁদের উপদেশনা গ্রহণ করেছিলাম। সেই পর্যন্ত গৌরীদির সঙ্গে আমার কমবেশি যোগাযোগ। গৌরীদির বাড়িতে গিয়েছি। মিলনদা'র সঙ্গে পরিচয় হয়েছে।

মিলনদাই প্রথম কলকাতা বিমানবন্দরে সত্তরের গোড়ায় আমার সঙ্গে সোমনাথদার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। সোমনাথদা আর মিলনদা তাঁদের কর্মজীবনের শীর্ষে এখন। মিলনদা ভারতের অ্যাটর্নি জেনারেল। সোমনাথদা ভারতবর্ষের লোকসভার সর্বসম্মত স্পিকার। এমন সর্বজনমান্যতা ক'জন পেয়েছেন!

বীরভূমে জন্ম। ছেলেবেলা কেটেছে রামপুরহাটে। সোমনাথদা সাধারণভাবে সারা ভারতের, বিশেষভাবে বোলপুরের এখন। বোলপুর-শান্তিনিকেতন আবাল্য দেখেছি প্রিয় খেলাঘরের মতো। এখন আর সেভাবে যাওয়া হয় না। মাঝে-মধ্যে শিক্ষাসংক্রান্ত কাজে যেতে হয়। ওখানে বাড়ি করেছেন, আছেন বহু পরিচিত প্রিয়জন। খুব কাছের মানুষ দু'জন চলে গেলেন সম্প্রতি, অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী ও অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ রায়।

রামপুরহাটে ছেলেবেলায় বাবা যাঁদের কথা প্রায়ই বলতেন উচ্ছ্বাসের সঙ্গে, তাঁদের মধ্যে ক'জন অতীতের ও সেদিনের বিখ্যাত আইনজীবী ছিলেন। রাধাবিনোদ পাল ও এন.সি. চ্যাটার্জির নাম শুনে-শুনে মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। তাঁরা তখনই কিংবদন্তী পর্যায়ে পৌঁছে গেছেন।

সেই কিংবদন্তী পুরুষের ছেলেও বাবার মতো কিংবদন্তী হয়ে উঠবেন এবং তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবে, কথা বলব, কিছুমাত্র কাছাকাছি হতে পারব, এমন তো কখনো ভাবি নি। কিন্তু সম্পর্ক একটা রয়ে গেছে। তাঁরই মহত্ত্বগুণে। তাঁর দুই মেয়ের বিয়েতেই মনে রেখেছিলেন। গিয়েছিলাম।

প্রাদেশিকতা হয়ে যাবে, তাই বলতে ভয় হয় কিন্তু সত্যিই কি মিলনদা আর সোমনাথদার জন্য একটু আলাদারকমের ভালো-লাগা অনুভব করলে অসঙ্গত হয়?

এই বই কেন সোমনাথদা'র জন্য?

তখনো চূড়ান্ত হয় নি, কিন্তু কথাটা উঠেছে, বিবেচনা করছে পার্টি, দূরদর্শনের পর্দায় সোমনাথদা, সঙ্গে একজন মহিলা-সাংবাদিক কথা বলছেন। এই কথোপকথনের পূর্ব মুহূর্তে একঝলক দেখতে পাই, সোমনাথদা একটা বই পড়ছেন। তার প্রথম অংশ দেখিনি, শেষ শব্দটা দেখি 'রিলিজন', ইংরেজি হরফে।

আমি আমূল শিহরিত বোধ করি।

কী অসাধারণ! ঠিক প্রসঙ্গ নিয়েই তো ভাবছেন ভারতবর্ষের লোকসভার সম্ভাব্য স্পিকার ....

তখনই ভাবি, গত তিন দশকেরও বেশি রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য প্রসঙ্গে যত ভেবেছি আর লিখেছি, তার প্রধান অংশই তো মানুষের ধর্ম। ভেবেছি রাবীন্দ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে। তেমন একটি নির্ভার ছোটোবই সোমনাথদাকে দিলে কেমন হয়?

আর ইউ জি সি-র যে মুখ্য গবেষণা প্রকল্প নিয়ে আমার কাজ তার শিরোনামই তো ছিল সাম্প্রদায়িকতা ও অস্পৃশ্যতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ। এই বইটি আমার কয়েকটি প্রাসঙ্গিক রচনার সংক্ষিপ্ত ও নির্বাচিত সংকলন। এর একটি ইংরেজি ভাষান্তরও প্রকাশিতব্য। ইংরেজি ভাষা-সাহিত্যের সুযোগ্য গবেষিকা মধুমিতা মুখোপাধ্যায় সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

আদর্শবাদী সুযোগ্য প্রকাশক শ্রী সন্দীপ নায়ক ইংরেজি ভাষান্তরটির উৎসাহী প্রস্তাবক। সন্দীপকে তো বটেই, সংশ্লিষ্ট সকলকেই অফুরন্ত শুভেচ্ছা। সুতপা মুখোপাধ্যায়, ঐন্দ্রিলা বসু, অনিন্দিতা মাইতি, রেশমা খাতুন সকলকেই। সরোজিনী নাইডু মহিলা কলেজের বাংলার প্রাক্তন বিভাগীয় প্রধান ও কথাশিল্পী নন্দিতা ঘোষের সহায়তা তো অপরিহার্য। ইতি

বইমেলা, ২০০৫

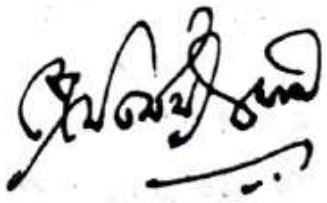

সূচিপত্র

রবীন্দ্রচেতনায় ভারতসংস্কৃতি ঃ বুদ্ধ থেকে মার্কস	১১
ভারত ও ইসলাম ঃ ইসলামের দৃষ্টিকোণ	২৪
ও আমার দেশের মাটি	৫৯
মরণবাঁচন নাচন-সভার ডঙ্কাতে	৭৭
কালের মন্দিরা যে সদাই বাজে	৮৭
রবীন্দ্রচেতনায় ধর্ম, দেবতা ও মানুষ	১১৩
একটি গণ্ডূষ জল	১৩৫

রবীন্দ্রচেতনায় ভারতসংস্কৃতি ঃ বুদ্ধ থেকে মার্কস

রবীন্দ্রজীবন ও সাহিত্যের সচেতন সমীক্ষকমাত্রেই অনুভব করতে পারেন, রবীন্দ্রভাবনায় ধর্ম কোনো বিচ্ছিন্ন কেতাবী 'শব্দ'-মাত্র নয়। বিশ্বের কোনো বিশেষ সম্প্রদায়ের ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থ থেকে আক্ষরিকভাবে তিনি কিছুই গ্রহণ করেন না। উপনিষদের কথাই ধরা যেতে পারে। তাঁর মনঃপূত কিছু শ্লোক বা শ্লোকাংশ অবশ্যই তিনি উদ্ধৃত করেন। কিন্তু সেগুলির প্রয়োগ ও ব্যাখ্যা বা ভাষা নিতান্তই রাবীন্দ্রিক। যেমন, বহু-উদ্ধৃত ও বহু-শ্রুত 'ভূমৈব সুখম্' পদদুটির ব্যাখ্যায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

'আমাদের দেশবাসীরা 'ভূমৈব সুখম্' এই ঋষিবাক্য ভুলে গেছে। ভূমৈব সুখম্-তাই জ্ঞানতপস্বী মানব দুঃসহ ক্লেশ স্বীকার করেও উত্তর মেরুর দিকে অভিযানে বার হচ্ছে, আফ্রিকার অভ্যন্তরপ্রদেশে দুর্গম পথে যাত্রা করছে, প্রাণ হাতে করে সত্যের সন্ধানে ধাবিত হচ্ছে। ··· আজ আমরা সে কথা ভুলেছি, তাই অত্যন্ত ক্ষুদ্র লক্ষ্য ও অকিঞ্চিৎকর জীবনযাত্রার মধ্যে আত্মাকে প্রচ্ছন্ন করে দিয়ে দেশের প্রায় সকল লোকেরই কাল কাটছে।' বিশ্বভারতী।।.৪ ভাদ্র ১৩২৯।।

এ কালে অর্থাৎ আধুনিক সময়েও ছাত্রছাত্রীদের ধর্ম, আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা শিক্ষার প্রয়োজন আছে বলে মনে করা হয়। রবীন্দ্রনাথ কোন্ ধর্মবোধের কথা, কোন্ ভূমার কথা বলেছেন, তা' বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই 'ভূমা'কে তিনি 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থে 'মানবভূমা' রূপে আখ্যাত করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের 'ধর্ম'-ভাবনা তাঁর শিক্ষাচিন্তা ও স্বদেশচিন্তার সঙ্গে ওতপ্রোত। 'বিশ্বভারতী'-তে সংকলিত ভাষণগুলিতে 'গান্ধারীর আবেদন' প্রভৃতি নাট্যকাব্যে, 'গোরা', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি উপন্যাসে, বিভিন্ন নাটকে, কয়েকটি ছোটোগল্পে, অনেক কবিতা ও গানে এবং প্রাসঙ্গিক অনেকগুলি গদ্যরচনায় বা প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ধর্মভাবনার বিশিষ্টতা অনুভব করা যায়।

সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্যে ও তাঁর জীবনেও তাঁর বিশিষ্ট ধর্মভাবনার প্রভূত পরিচয় পাওয়া যায়। সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনার শেষে রবীন্দ্রনাথেরই অনুসরণে সেই ধর্মকে মানুষের ধর্ম তথা 'রিলিজন অব ম্যান'-ই বলতে হয়। গ্রামবাংলার বাউল কবিদের কথাই রবীন্দ্রকৃত আলোচনার উপসংহারে চলে আসে। প্রসঙ্গত মধ্যযুগের সন্ত কবিদের কথাও। এ নিয়ে অবশ্য রবীন্দ্র-ক্ষিতিমোহন সম্পর্ক সূত্রটি স্মরণীয়। 'সাধনা' কাকে বলে, কী তার স্বরূপ, তা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ আর-একটি বিশ্বভারতী-ভাষণে বলেছিলেন—

'আমাদের দেশে সাধনা বলতে সাধারণত মানুষ আধ্যাত্মিক মুক্তির সাধনা, সন্ন্যাসের সাধনা ধরে নিয়ে থাকে। আমি যে সংকল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে আশ্রম স্থাপনার উদ্যোগ করেছিলুম, সাধারণ মানুষের চিত্তোৎকর্ষের সুদূর বাইরে তার লক্ষ্য ছিল না। যাকে সংস্কৃতি বলে তা বিচিত্র, তাতে মনের সংস্কার সাধন করে, আদিম খনিজ অকথার অনুজ্জ্বলতা

থেকে তার পূর্ণ মূল্য উদ্ভাবন করে নেয়। এই সংস্কৃতির নানা শাখাপ্রশাখা, মন যেখানে সুস্থ সরল, মন সেখানে সংস্কৃতির এই নানাবিধ প্রেরণাকে আপনিই চায়।

'ব্যাপকভাবে এই সংস্কৃতি-অনুশীলনের ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠা করে দেব, শান্তিনিকেতন আশ্রমে এই আমার অভিপ্রায় ছিল। আমাদের দেশের বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের পরিধির মধ্যে জ্ঞানচর্চার যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট আছে কেবলমাত্র তাই নয়, সকল রকম কারুকার্য শিল্পকলা নৃত্যগীতবাদ্য নাট্যাভিনয় এবং পল্লীহিতসাধনের জন্যে যে-সকল শিক্ষা ও চর্চার প্রয়োজন সমস্তই এই সংস্কৃতির অন্তর্গত বলে স্বীকার করব। চিত্তের পূর্ণবিকাশের পক্ষে এই সমস্তেরই প্রয়োজন আছে বলে আমি জানি। খাদ্যে নানা প্রকারের প্রাণীন পদার্থ আমাদের শরীরে মিলিত হয়ে আমাদের দেয় স্বাস্থ্য, দেয় বল; তেমনি যে-সকল শিক্ষণীয় বিষয়ে মনের প্রাণীন পদার্থ আছে তার সবগুলিরই সমবায় হবে আমাদের আশ্রমের সাধনায় এই কথাই আমি অনেক কাল চিন্তা করেছি।'

১৩৪৫ বঙ্গাব্দের ৮ পৌষ প্রদত্ত এই ভাষণটি থেকে স্পষ্ট, রবীন্দ্রভাবনায় ধর্ম মানবসংস্কৃতির তথা ভারতসংস্কৃতির অঙ্গারূপে সমধিক ভাস্বর।

'ভূমা'র কথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু 'ভূমি'র কথা ভুলে গিয়ে নয়। 'ভূমি' অর্থাৎ কৃষি। ১৯৩০ সালে তদানীন্তন সোভিয়েত রাশিয়া ভ্রমণ শেষে ২ অক্টোবর ১৯৩০ বার্লিন থেকে চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, দেশের ও জাতির সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যে রাশিয়া মগ্ন ছিল 'শিক্ষা, কৃষি এবং যন্ত্র নিয়ে ··· ১৯১৭ খ্রিস্টাব্দে এখানে যে বিপ্লব হয়ে গেল তার আগে এদেশে (রাশিয়ায়) শতকরা নিরানব্বই জন চাষি আধুনিক হলযন্ত্র চক্ষেও দেখেনি।

'সেদিন আমাদেরই চাষিদের মতো সম্পূর্ণ দুর্বলরাম ছিল। নিরন্ন, নিঃসহায়, নির্বাক। আজ দেখতে দেখতে এদের খেতে হাজার হাজার হলযন্ত্র নেমেছে। ···

'কিন্তু শুধু যন্ত্রে কোনো কাজ হয়না যন্ত্রী যদি মানুষ না হয়ে ওঠে। এদের খেতের কৃষি মনের কৃষির সঙ্গে সঙ্গে এগোচ্ছে। এখানকার শিক্ষার কাজ সজীব প্রণালীতে। আমি বরাবর বলে এসেছি শিক্ষাকে জীবনযাত্রার সঙ্গে মিলিয়ে চালান উচিত। তার থেকে অবচ্ছিন্ন করে নিলে ওটা ভান্ডারের সামগ্রী হয়, পাকযন্ত্রের খাদ্য হয় না। ··· এরা শিক্ষাটাকে প্রাণবান করে তুলেছে।'

বিপ্লবের তেরো বছর পরে রাশিয়ায় গিয়ে রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ ও অভিভূত হয়েছিলেন— 'শিক্ষা, কৃষি এবং যন্ত্র : এই তিন পথ দিয়ে সমস্ত জাতি মিলে চিত্ত, অন্ন এবং কর্মশক্তিকে সম্পূর্ণতা দেবার সাধনা'— দেখে। রবীন্দ্রনাথ উল্লেখ করতে ভোলেননি, 'আমাদের দেশের মতোই প্রাক্-বিপ্লব পর্যায়ে রুশ দেশের মানুষও ছিল কৃষিজীবী।'

পুনরাবৃত্তি মার্জনীয়, এইসব কথা রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন রাশিয়া হয়ে আমেরিকার দিকে যাত্রাকালে বার্লিন থেকে ১৯৩০-এর ২ অক্টোবর তারিখে আর তার কয়েকটি দশক পরে ইউনেস্কো-র নির্ধারণও সারত অভিন্ন—

'Culture means the total accumulation of material objects, ideas, symbols, beliefs, sentiments, values and social forms which are passed on from one generation to another in any given society'—

ইউনেস্কোর Traditional Cultures in South-East Asia গ্রন্থে প্রদত্ত 'Culture' -এর এই অর্থ সাধারণভাবে স্বীকার করে নিতে কোনো বাধা নেই। একটি জাতির কালচার-এর স্বরূপ-পরিচয় উদ্ধার করতে হলে বিষয়টিকে দু'দিক থেকে বিচার করা উচিত। বিষয়টিকে আমরা এইভাবে বুঝতে চেষ্টা করতে পারি—

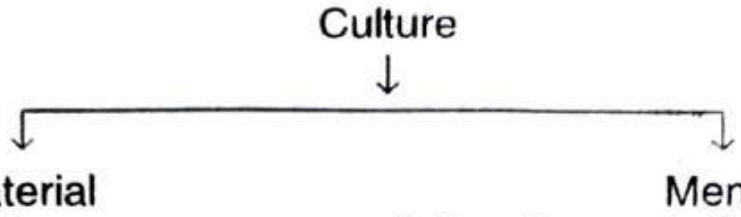

ভারতসংস্কৃতিকে বুঝতে হলে তাকেও এই উভয় দিক থেকেই বিচার করতে হবে।

অনেকের ধারণা, তাঁদের মধ্যে ভারতীয় ও অ-ভারতীয় পণ্ডিতেরাও আছেন, যে, ভারত-সংস্কৃতি বুঝি কেবল তত্ত্ববিদ্যা-অন্বেষণেই সময়, শ্রম ও ধী-শক্তিকে ব্যবহার করেছে — প্রথম থেকে এ-পর্যন্ত। সাধারণ ভারতীয়রা যখন তাঁদের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে কিছু বলেন এবং গৌরববোধ করতে চান, তখন মানুষের অন্তর্জীবনের উচ্চতম ও সূক্ষ্মতম দিকগুলি নিয়ে ভারতবর্ষ যে অবিশ্বাস্য বিশ্লেষণ-প্রতিভার ও চিন্তাশক্তির পরিচয় দিয়েছে, সে দিকটিকেই প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। এমন-কি 'কালচার'-এর ওই mental দিকটিকেই 'একমাত্র' বলে চিহ্নিত করতে চান।

এর ফলে দু'টি বড়ো রকমের ক্ষতি আমাদের হয়ে গেছে। প্রথমত, বিশ্বে এবং এমন-কি ভারতবর্ষে ভারতীয়দের কাছেও ভারত-সংস্কৃতির অখণ্ড পরিচয় অজ্ঞাত থেকে গেছে। দ্বিতীয়ত, ওই mental দিকটিকেই আঁকড়ে ধরতে গিয়ে সংস্কৃতির material দিকটি সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্য চরম হওয়ায় সংস্কৃতির পার্থিব, প্রত্যক্ষ ও বাস্তব দিকটিতে আমাদের কাজ ও অগ্রগতি ক্ষতিকরভাবে ব্যাহত হয়েছে।

মনে রাখা খুবই জরুরি যে, একটি সংস্কৃতির আদি-পর্যায়ের অগ্রগতি ও বিবর্তন তার পার্থিব বাস্তব দিকটিকে কেন্দ্র করেই ঘটে থাকে। ভারত-সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তার কোনো ব্যতিক্রম ঘটেনি, ঘটার কথাও ছিল না। ভারত-সংস্কৃতির বাস্তব দিকটির সূচনাকাল নির্ণয় করা সুকঠিন, উপযুক্ত ও নির্ভরযোগ্য তথ্যাদির অভাবে, — এ কথা সত্য।

কিন্তু ঋগ্বেদ শুধু ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিরই প্রথম প্রামাণ্য গ্রন্থ নয়, ঋগ্বেদ মানবসভ্যতারই প্রথম লিখিত নিদর্শন। ঋগ্বেদ থেকেই এমন এক জাতির পরিচয় আমরা পাই, যাঁরা কৃষিবিদ্যা, কুটিরশিল্প এবং গ্রামসংগঠনে রীতিমতো অগ্রসর হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, কাব্যকবিতা ও রণবিদ্যা প্রভৃতির প্রতি সমপরিমাণেই তাঁদের আগ্রহের পরিচয় দিয়ে তাঁদের সামগ্রিক জীবননিষ্ঠাকেই অভ্রান্তভাবে তুলে ধরেছিলেন।

সিন্ধুসভ্যতা ঋগ্বেদ-পূর্ববর্তী কী-না তা' নিয়ে ঐতিহাসিক ও গবেষকবৃন্দ একমত নন। সিন্ধুসভ্যতা যদি প্রাচীনতর হয়, তা-হলে' ভারতবর্ষ যে অধিকতর সুপ্রাচীন কালেই উচ্চাঙ্গের ও সুমার্জিত নাগরিক সভ্যতার অধিকারী ছিল, সেটাও প্রমাণিত হয়। আর সিন্ধুসভ্যতার কাল যখনই নির্দিষ্ট হোক না কেন, ভারতবর্ষের সমাজ-প্রগতি যে সুপ্রাচীন কালেরই ঘটনা, তা' নিয়ে কোনো তর্ক নেই। সেইজন্যই, পার্থিব-বাস্তব পর্যায়ে ভারত-

সংস্কৃতির সমুন্নতির ফলে ঋগ্বেদ-এর যুগের ভারতীয়গণ [Indo-Aryans] জীবনধারণের সমস্যা-সমাধানের পাশাপাশি মানুষের অন্তর্জীবনের উচ্চতম ও সূক্ষ্মতম দিকগুলি নিয়ে গভীরচিন্তায় মগ্ন হওয়ার অবকাশও পেয়েছিলেন। এই ভারতীয়গণ ছিলেন কর্মঠ ও ধীমান। আর তাঁদের ছিল সূক্ষ্মচিন্তার অবসর। তাঁরা সহজেই তাঁদের সেই উদ্বৃত্ত সময় ও বুদ্ধিকে আত্মানুসন্ধানের কাজে লাগাতে পেরেছিলেন। নৃতত্ত্ব [Science of anthropology] থেকে জানতে পারি, অগ্রগতির কোন্ পর্যায়ে মানুষ, মানুষের অন্তর্জীবন বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হয়ে ওঠে। বেশি কথা খরচ না করে বিষয়টি এইভাবে সাজিয়ে দেওয়া যায় —

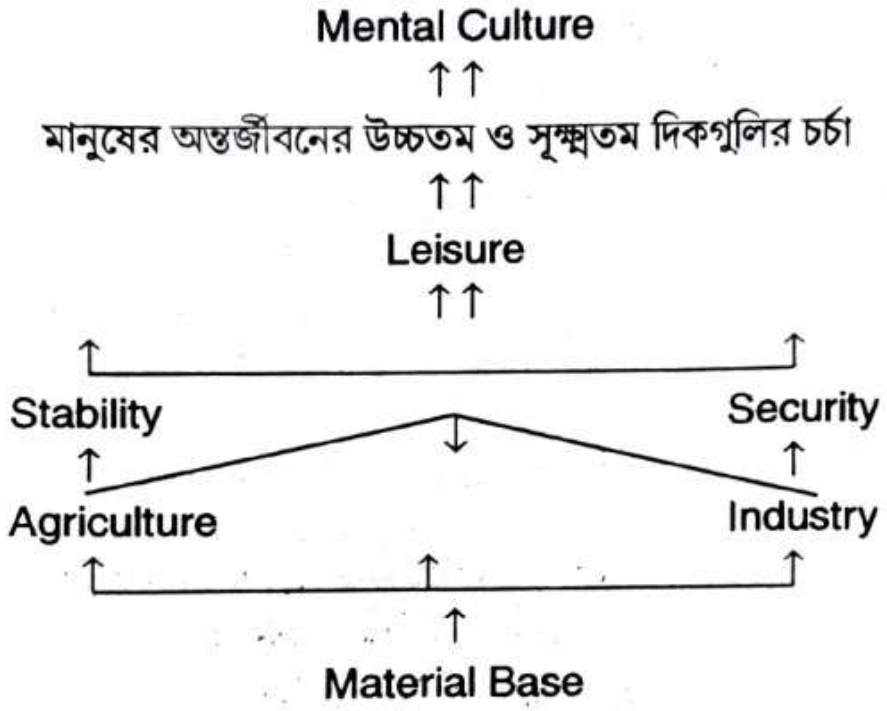

ঋগ্বেদ থেকেই আমরা জানতে পারি, অতি প্রাচীনকালেই আমরা মানুষের অন্তর্জীবনের স্বরূপ নির্ণয়ে অগ্রসর হয়েছিলাম। কাব্যকবিতার কথা আগেই বলেছি। কিন্তু শুধু সাহিত্যেই নয়, দর্শন-এর (Philosophy) ক্ষেত্রেও আমাদের বিচার-বিশ্লেষণ ও জিজ্ঞাসার অন্ত ছিল না। জগৎ ও জীবনের স্বরূপ এবং মানুষের অস্তিত্বের অর্থ নিয়ে আমাদের অনুসন্ধান ও জিজ্ঞাসার সূচনা হয়েছিল সুপ্রাচীনকালে, ঋগ্বেদ-এর সময় থেকেই। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ভারত-সংস্কৃতির অন্তর্মুখী স্বভাব জীবনের পার্থিব দিকটিকে অগ্রাহ্য করে তো নয়ই, পরন্তু আত্মস্থ করে, পার্থিব ও বাস্তব প্রয়োজনকে যথোচিত স্বীকৃতি জানিয়েই, তাকে অতিক্রম করে গড়ে উঠেছিল।

কথাগুলি আজ এইজন্য মনে রাখতে হবে যে, স্বাধীনতা উত্তরকালেও আমরা আমাদের Material Base-টাকে এড়িয়ে গিয়ে, আমাদের Agriculture ও Industry-কে অর্ধমনস্কভাবে মৌখিক স্বীকৃতি জানিয়ে, 'রসের চাষ' নিয়ে বহুজনে মিলে মাতামাতি করছি। কিন্তু আধুনিক যুগের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের Material base-কে আরো অনেক বেশি মজবুত করতে না পারলে, আমাদের ললিতকলা, সাহিত্য ও দর্শনচর্চা শক্ত ভিত্তির অভাবে জীবন-বিমুখ ও জীবন-বিরোধী হয়ে পড়বে।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা Mental Culture-এর ক্ষেত্রে যে অসামান্য অগ্রগতির পরিচয় দিতে পেরেছিলেন তার কারণ Material Base-সম্পর্কে তাঁরা আদৌ উদাসীন ছিলেন না। আমরা Material Base-সম্বন্ধে এ-কালেও অনেকেই অজ্ঞ ও উদাসীন।

এই অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য যথাসত্বর সামগ্রিকভাবে জাতি হিসেবেই আমাদের কাটিয়ে উঠতে হবে। বস্তুত, কাটিয়ে উঠতে না পারলে অস্তিত্ব বাঁচিয়ে রাখাই কঠিন হবে। তার অর্থ কিন্তু এই নয় যে, মানুষের অন্তর্জীবনের উচ্চতম ও সূক্ষ্মতম দিকগুলির চর্চা একেবারে শিকেয় তুলে রাখতে হবে। কারণ শুধু তাতেই তো কোনো লাভ নেই। একটার চর্চা বাদ দিলেই যে আর একটার অর্থাৎ আমাদের সংস্কৃতির পার্থিব, প্রত্যক্ষ ও বাস্তব দিকটির অনুশীলন হু-হু করে বেড়ে যাবে, তা-ও তো নয়।

আদর্শ অকথা বা ব্যকথাটা হচ্ছে : একটা দেশে ও সমাজে যখন সামঞ্জস্য বজায় রেখে আমাদের জৈবিক ও আত্মিক তৃষ্ণাগুলি নিবারণের জন্য আমরা কাজ করতে পারি। সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে দুটো চালাতে পারলেই মানবস্বভাবের তথা বিশ্বসভ্যতা ও সংস্কৃতির একটা পূর্ণাঙ্গ অগ্রগতি ও বিকাশ সম্ভব হয়। একটি দেশ ও জাতির পক্ষেও সেটাই আদর্শ ও লক্ষ্য হওয়া উচিত।

বস্তুনিষ্ঠভাবে বলতে গেলে, আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি যান্ত্রিকভাবে আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। প্রাচুর্যের মধ্যে বসেও বিজ্ঞানকে চাকরের মতো খাটিয়েও ঐ সভ্যতা ও সংস্কৃতি চাপা কান্নায় নিরন্তর ফোঁপাচ্ছে। ভোগবাদী আধুনিক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতি অবসাদগ্রস্ত, নৈরাশ্যপীড়িত, মৃত্যুতাড়িত। স্বাভাবিক মৃত্যু হওয়ার আগেই সে আত্মহত্যা করে বসতে পারে। বলাই বাহুল্য, আত্মহত্যা করলে করবে খুবই আধুনিক ও উন্নতমানের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতেই। বেঁচে যাওয়ার একটিমাত্র পথ ভোগবাদী সংস্কৃতির সামনে খোলা আছে। প্রখর কাণ্ডজ্ঞানের (Common sense) ফলে যদি ভোগবাদী আজ উপলব্ধি করতে পারে যে, লোকায়ত সংস্কৃতির ঐশ্বর্যের মধ্যেই তার মুক্তির সম্ভাবনা নিহিত, তা হলে ওরাই শুধু বেঁচে যাবে না, বিশ্বসংস্কৃতিও পূর্ণাঙ্গ ও সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিণামের পথে পৌঁছাবে। পশ্চিম পুঁজিবাদের গ্রাস থেকে বাঁচুক। কিন্তু আমাদের আত্মবিস্মরণ ও পাশ্চাত্য-অনুকরণস্পৃহা আমাদের মৃত্যুর দিকেই ঠেলে দিচ্ছে। আমরা কি বাঁচব না?

আমরা Material Base-টাকে মজবুত করবো, কিন্তু Mental Culture-এর বিনিময়ে কি? Material Base-টাকে মজবুত করার জন্য পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সাহায্য আমাদের নিতেই হবে, কিন্তু সেই সাহায্য গ্রহণ ও তার প্রয়োগের বেলায় আমরা দেশের ধ্যানধারণা, ঐতিহ্য, মানবীয় মূল্যবোধ — এ সব কিছুই কি ভুলে থাকব?

গ্রহণ করা মানে কি এলোমেলোভাবে ভিখারির মন নিয়ে, লোভীর মন নিয়ে নেওয়া? না কি আত্মস্থ করা? কী আত্মস্থ করা সম্ভব? যা আমার প্রবণতার সঙ্গে মেলে। কখন আত্মস্থ করা সম্ভব? যখন আমি বুঝি, আমি কে এবং আমি কী।

আমার মতো অনেকেই হয়তো সংশয়গ্রস্ত, পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান ও সংস্কৃতি থেকে আমরা এলোপাতাড়ি গ্রহণ করছি, প্রয়োগের মধ্যেও মোহ যতটা সক্রিয়, দূরদৃষ্টি ততটা নয়। এর ফলভোগ জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে চলছে। এমনি চলবে কতকাল?